ডায়াবেটিস নিউজলেটার

দাম ১০ টাকা

হার্ট এ্যাটাক ও স্ট্রোক এক নয়

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ

আমাদের মধ্যে অনেকেই হার্ট এ্যাটাককে স্ট্রোক বলে ভুল করেন। হার্ট এ্যাটাক বলতে হার্টের করোনারি আর্টারির সংকোচনের কারণে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহের ব্যাঘাত বোঝায় এবং রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহের অসুবিধার কারণে হার্টের কার্যমতা বিভিন্নভাবে ব্যাহত হয়। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়পড়ানি এমনকি কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট নিয়েও রোগীরা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বা ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হয়।

স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ব্রেনের অভ্যন্তরে রক্ত সরবরাহের নালীগুলো সংকুচিত হয়ে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি বা রক্তনালীর অভ্যন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করলে রক্তক্ষরণ হয়। রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হলে এবং ব্রেনের সেলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এর ফলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, এমনকি এসব সমস্যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা বা পঙ্গুত্বের কারণ হতে পারে। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই ঘাতক ব্যাধি দুটোর কারণ মূলত একই। যে সমস্ত কারণে রক্তনালী সংকুচিত (Atherosclerosis) হয়ে হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়ে থাকে সেগুলোকে Risk factor বলা হয়। Risk factor-গুলোর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, রক্তের চর্বিজাতীয় পদার্থের আধিক্য, ধুমপান, বয়স ও বংশ ইতিহাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হার্ট এ্যাটাক ও স্ট্রোক ৪০-এর বেশি বয়সী পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। তবে ৫০-এর বেশি বয়সে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ থাকে না বরং নারীদেরই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর দশ লাখেরও অধিক লোক হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়। তার ভিতর প্রায় অর্ধেকই মৃত্যুবরণ করে। যাদের মৃত্যু হয় তাদের ভিতর আবার অর্ধেকই হার্ট এ্যাটাকের ১ ঘন্টার ভিতর এমনকি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করে। তাই উন্নত বিশ্বে হার্ট এ্যাটাকের চিকিৎসা রোগীর বাড়ি থেকেই শুরু হয়। Toll free টেলিফোন নম্বরে কল করে সাথে সাথে এম্বুলেন্স ডেকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

হার্ট এ্যাটাকের রোগীরা সাধারণত বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা বুকের ধড়পড়ানি নিয়ে হাসপাতাল বা ডাক্তার-এর শরনাপন্ন হয়। বেশিরভাগ সময়ে উল্লেখিত উপসর্গগুলি মাঝরাত থেকে সকালের দিকে হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বুকে কোন প্রকার ব্যথাই থাকে না।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাস্থ্য খবর

কিডনি রোগ প্রতিরোধ সম্ভব

সচেতনতার সঙ্গে আট ধরনের নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে ৬০ শতাংশ কিডনি বিকল রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে 'সবার জন্য সুস্থ কিডনি: প্রয়োজন গণসচেতনতা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার বক্তারা এ কথা বলেন। কিডনি অ্যাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাইটি জাতীয় প্রেসক্লাবে এই আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনার বক্তারা বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলো ৫ শতাংশ কিডনি বিকল রোগীর চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে কিডনি রোগ প্রতিরোধে আটটি নিয়ম কঠোরভাবে অনুশীলনের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। এগুলো হলো কায়িক পরিশ্রম ও নিয়মিত ব্যায়াম, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, পর্যাপ্ত পানি পান করা, ধুমপান থেকে বিরত থাকা, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন না করা এবং নিয়মিত কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।

ভালো থাকার পূর্বশর্ত

দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিনটা শুরু করুন। স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার এটাই প্রথম পূর্বশর্ত। অন্য সবাই ঘুমাক। আপনি জেগে উঠে ধ্যান (মেডিটেশন) ও হালকা কিছু শারীরিক ব্যায়াম করে নিতে পারেন। নিয়মিত এ ধরনের অভ্যাস করলে বাড়তি প্রশান্তি পাবেন, যা অন্যদের থেকে আপনাকে এগিয়ে রাখবে বহুগুণ। সকালের শুরুতে মনটা নানামুখী চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয় না। এ সময় আশপাশের পরিবেশ এবং বাতাস থেকে মানসিক প্রশান্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দিনের সবচেয়ে সতেজ ও বিশুদ্ধ পরিবেশ ভোরবেলা ছাড়া আর কখনো পাওয়ার সুযোগ নেই। সকালে হাঁটা তাই স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।

মন ভালো তো সব ভালো

আনোয়ারা সৈয়দ হক

মানুষের একটা শরীর আছে, এই শরীর নিয়ে আমাদের বড় টানাপোড়েন। শরীরের কোথাও আঘাত লাগলে আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন বোধ করি। আর শরীরের যদি কোন অসুখ বিসুখ হয় তাহলে তো কথাই নেই, ডাক্তার নার্স , হাসপাতাল, ওষুধ সে এক তুলকালাম কান্ড। বাড়ির মানুষজন একেবারে তটস্থ হয়ে যায়। তারপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তার হয়তো বলেন: আপনার শরীরে বিশেষ কোন রোগ নেই, সামান্য ডায়াবেটিস আছে, একটু প্রেসার হাই বটে, তবে সেটা এমন কিছু না, এজন্যে আপনার কোন ক্ষতি হচ্ছে না। এই ওষুধটা শুধু নিয়মিত খেয়ে যাবেন।

কিন্তু রোগী একথা শুনে নিশ্চিন্ত হন না। কেন হবেন? 'আমার শরীরে এত উপসর্গ আর ডাক্তার বলেন আমি ভাল আছি, এটা কি কোন কথা হলো?' মনে মনে একথা বলেন রোগী।

সেদিন আমার চেম্বারে একজন তরুণ এসে হাজির হলেন। তিনি তার বাবার সাথে এসেছেন। বাবার বয়স পঁয়তাল্লিশ, তরুণের বয়স পঁচিশ। তরুণটি এসেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, আপনারা ডাক্তাররা সব গলাকাটা। কী রকম? আমি জিজ্ঞেস করলাম। কথাটা বলে আমি ভাবলাম, বুঝি তিনি আমাদের অর্থাৎ ডাক্তারদের কনসালটিং ফিস-এর কথা বলছেন।

তরুণটি সেদিকে না গিয়ে বলে উঠলেন, আপনারা গলাকাটা এ কারণে যে রোগীর রোগের কথা আপনারা বিশ্বাস করতে চান না। অথচ আমাদের কি ভূতে কিলিয়েছে পয়সা দিয়ে আপনাদের কাছে দেখাতে আসব?

একথা অবশ্যই সত্যি। তরুণের কথায় আমি মাথা নাড়লাম।' তারপর তার বাবার দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন, আসলে প্রফেসর আজাদ খানের প্রতি আমার ছেলের ভীষণ রাগ হয়েছে।

রাগ হয়েছে, কেন? আমি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কারণ তিনি ওর শরীরে কোন রোগ খুঁজে পাননি। উল্টো মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞকে দেখাতে পরামর্শ দিয়েছেন।

তাই নাকি? মুখে আমি জিজ্ঞস করলাম। কারণ মানসিকভাবে অসুস্থ বহু রোগী প্রথমে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে অস্বীকার করেন।

আমি এরপর জিজ্ঞেস করলাম, প্রফেসর আজাদ এ ধরনের সিদ্ধান্তে এলেন কীভাবে? তরুণটির বাবা এবার বললেন, প্রফেসর আজাদ খুব ব্যস্ত মানুষ। তিনি আমার ছেলের দিকে একপলক তাকিয়ে বললেন, তোমার অসুখ কি বলোতো ছেলে? উত্তরে আমার ছেলে বললো, 'ডাক্তার সাহেব আমার শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই। সামান্য আঙুল তুলে কিছু যে বলবো কাউকে সে ক্ষমতাও নেই।' উত্তরে প্রফেসর সাহেব বললেন 'ঠিক এই মুহূর্তে চিড়িয়াখানা থেকে যদি কোন বাঘ ছুটে এই ঘরে ঢুকে পড়ে, তুমি তখন কি করবে? উত্তরে আমার ছেলে বললো,' ছুটে পালাবো'। তো তখন প্রফেসর সাহেব বললেন, 'তখন ছুটবে কি করে? যাও তোমার কোন অসুখ নেই। তুমি মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যাও।' তাতে আমার ছেলে খুব রাগ করেছে।

তরুণের বাবার কথা শুনে আমি হাসি গোপন করে বললাম, ' প্রফেসর সাহেব কোন পরীক্ষা করেননি? 'হ্যাঁ, সব পরীক্ষা আগেই শেষ করেছিলেন। তারপরই তো এই কথা বললেন।' তরুণটি এবার বিষ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বুঝতে পারছেন না আব্বা, এইসব ডাক্তারদের প্রতি আমার কোন আস্থা বা ভরসা নেই। আমি এনাকেও দেখাতে চাইনি, আপনি জোর করে নিয়ে এসেছেন।'

বাবাকে এবার পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলে তরুণটির সঙ্গে আমি কথা বলতে লাগলাম। কথা অবশ্য সেই বলতে লাগল, আর আমি শুনতে লাগলাম। তরুণটির প্রাণের ভেতরে কত যে কথা, কত অজস্র কথা, কত জটিল, জট পাকানো, অসংলগ্ন, বিক্ষুব্ধ বাক্যরাশি তার পঁচিশ বছরের বুকটির ভেতর জমা হয়ে আছে তার আর লেখাজোকা নেই। যেন সে তার অবরুদ্ধ মনের দুয়ার হাট করে খুলে মেলে দিয়েছে আমার সামনে, আর আমি মনোযোগ দিয়ে শুনে চলেছি তার বাক্যালাপ।

কথা বলতে বলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল সে আর আমি সেই তরুণটির ভেতরে আবিষ্কার করলাম ভীত, ভয়চকিত, দ্বিধান্বিত, অপরাধবোধে জর্জরিত, অনিশ্চয়তাবোধ দ্বারা তাড়িত একটি মানুষকে, যে নাকি জীবনের বাস্তবতাকে তার মনের কল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে একেবারে অপারগ। মনের এই জটিলতা তার ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে যে সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তার জন্য বড় মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সর্বপ্রকার গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও এই বাস্তব, রুক্ষ, আপোসহীন পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সে নিজেকে আর তাল মেলাতে পারছে না। সবচেয়ে বড় কথা, বাস্তবের দাবিকে খোলা চোখে দেখে যাচাই করাও তার পক্ষে যেন আর সম্ভব নয়।

শেষমেশ তাহলে কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এই যে, তরুণটি সত্যি সত্যি মানসিক অসুস্থতার শিকার, কিন্তু তার বুদ্ধিদীপ্ত মন, যাকে intelligence বলা হয় সেটা মানতে রাজি নয়। এখানে বলা ভাল, ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা সমান্তরাল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব নাজুক হলেও বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকে বেশিরভাগ সময়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের নাজুকতার জন্য বুদ্ধি ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে না। সেই হিসেবে ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা একে অপরের সম্পূরক নয়। বুদ্ধি বুদ্ধির জায়গায় থাকে, আর ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বের জায়গায়।

এবার তাহলে বলি, মানুষের শরীরের তিরিশ থেকে চল্লিশভাগ রোগ উৎপত্তি হয় মনের ভেতর থেকে। আমাদের সমাজ-সংসার, পরিবেশ, ব্যক্তিগত জীবন মনকে যখন গোপনে গোপনে অস্থির করে রাখে কিন্তু বাইরে প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকে না, তখন শরীরের ভেতর দিয়ে সেই অশান্তি, অস্থিরতা, মানসিক কষ্ট যেন গুটি বসন্তের মত ফুটে ওঠে।

টাকা পয়সা মনকে কোন শান্তি দেয় না, বরং সুস্থ একটি মন টাকা-পয়সার চেয়েও অনেক বড় জিনিস, যদিও আমরা সারাটা জীবন টাকাপয়সার জন্যেই ছুটে বেড়াই। মন ভাল তো সব ভাল, এটি একটি বেদবাক্যের মতই সত্যি কথা। কিন্তু এই মনকে ভাল রাখবো কীভাবে, যদি আমার সময় এবং পরিবেশ সুস্থ না থাকে। তবে তারও উপায় খুঁজে বের করা যাবে চেষ্টা করলে। কখনও সময় হলে এই নিয়ে আলোচনা করবো।

আনোয়ারা সৈয়দ হক
কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, বারডেম

ডায়াবেটিস রোগীর হাত পা জ্বালার প্রতিকার প্রতিরোধ এবং পায়ের যত্ন

অধ্যাপক ডা. মো. আমিরুল হক

ডায়াবেটিস এমন একটা রোগ যা কোনোদিনও সারে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। এমনকি জটিলতাও প্রতিরোধ করা যায়। তাহলেও ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনে চলতে চলতে একটা সময় জটিলতা দেখা দেয় এবং তা প্রায় শরীরের সব কটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই আক্রান্ত করে। আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্র এ থেকে রেহাই পায় না। স্নায়ুতন্ত্রের যে বিভাগ হাত-পা সাপ্লাই করে তাকে পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র বলে। পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের ডায়াবেটিসজনিত জটিলতাকে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি বলা হয়। এই নিউরোপ্যাথিই ডায়াবেটিক রোগীদের হাত ও পা বিশেষ করে, পায়ের জ্বালা যন্ত্রণার কারণ।

নিউরোপ্যাথির উপসর্গ হচ্ছে– হাত ও পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে, মাংসপেশীতে ব্যথা ও খিঁচুনি হয়, পায়ের তালুতে জ্বালা-পোড়া হয়, মনে হয়; কিছু একটা যেমন তুলো, কাদা লেগে আছে, হাঁটলে মনে হয়; বালু বা তুলোর ওপরে হাঁটছে। পায়ের জ্বালা-পোড়া এতই তীব্র হতে পারে যে, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং রোগীরা রাতে উঠে বালতিতে ঠান্ডা পানি রেখে তাতে পা ডুবিয়ে রাখেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। যেমন, পরনের কাপড়ের ঘর্ষণে বা রাতে বিছানার চাদরের ঘর্ষণে আরও বিরক্তিকর ও অস্বাভাবিক অনুভূতি হয় বা জ্বালা-পোড়া বেড়ে যায় এবং ব্যথা হয়। পরীক্ষা করলে বেশিরভাগ সময় পায়ের স্নায়ুতন্ত্রের অসাড়তা বা সংবেদনহীনতা পাওয়া যায়। পায়ের স্যান্ডেল খুলে পড়ে গেলেও রোগীরা টের পান না। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে স্নায়ুর সংবেদনশীলতা অত থাকে না। ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির কারণে পায়ের মাংসপেশী শুকিয়ে যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথাও অনুভূত হতে পারে। পা দুর্বল হয়ে যায় এবং হাঁটতেও সমস্যা হতে পারে।

নিউরোপ্যাথি হওয়ার কারণ

রক্তের মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ ও তার বিপাকের গোলযোগই ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথির জন্য দায়ী। ডায়াবেটিসজনিত স্নায়ুর জটিলতা হয় একটা বিপাকীয় পথে। সাধারণ মানুষের জন্য এটা বোঝা একটু মুশকিল। ডায়াবেটিস রোগটা শরীরের একটা বিপাকীয় রোগ। বিপাকীয় পলিঅল পথে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হয়। স্নায়ুর সোয়ান কোষে এলডোজ রিডাকটোজ নামক এক পাচক রস থাকে। এই পাচক রস গ্লুকোজ থেকে সরবিটল তৈরি করে। স্নায়ুতন্ত্রের কোষগুলা যখন অতিরিক্ত গ্লুকোজের সংস্পর্শে আসে তখন অতিরিক্ত সরবিটল তৈরি হয়। এই সরবিটলই হচ্ছে, স্নায়ুনাশকতার উপাদান এবং স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতার শুরু এখান থেকেই। পরীক্ষামূলকভাবে এলডোজ রিডাকটোজ ইনহিবিটর দিয়ে পলিঅল পথরুদ্ধ করে দিতে পারলে স্নায়ুর জটিলতার লাঘব করা যায়।

চিকিৎসা

ক) রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখা, যা ইনসুলিনের মাধ্যমে অতি সহজেই পারা যায়।

খ) ব্যথা ও সংবেদজনিত উপসর্গের উপশম করা।

প্রতিরোধ

রক্তের মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ এবং তার বিপাকীয় গোলযোগ হচ্ছে, নিউরোপ্যাথির কারণ। তবে অন্য কোন কারণ যেমন– জেনেটিক নির্ভরশীলতা অথবা গ্লুকোজ ছাড়া অন্য বিপাকীয় গোলযোগও দায়ী থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে পুরোপুরি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখলে কোনো দিন নিউরোপ্যাথি হবে না, এটা শতভাগ নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটা প্রমাণিত যে ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখলে এ ধরনের জটিলতা ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। সুতরাং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথি হতে না দেয়াই উত্তম। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের তিনটি মূলসূত্র হলো:

ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখলে নিউরোপ্যাথির জটিলতা ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়

১) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

২) ব্যায়াম ও শৃংখলা

৩) যথাযথ ওষুধ

আমরা এতক্ষণ ডায়াবেটিসজনিত পায়ের স্নায়ুর জটিলতা বা নিউরোপ্যাথি সম্পর্কে জানলাম। নিউরোপ্যাথি থেকে পায়ের কি জটিলতা হতে পারে তাও জানা দরকার। স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই আমরা ব্যথা, স্পর্শ, উষ্ণতা ও শীত ইত্যাদি অনুভব করি। আমাদের মস্তিষ্কে এই অনুভূতির সংকেত স্নায়ুতন্ত্র বহন করে নিয়ে যায় এবং আমরা এগুলো অনুভব করতে সক্ষম হই। নিউরোপ্যাথি হলে স্নায়ুতন্ত্রের এই বহন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সংকেতগুলো আর মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে না। তখন কোনো আঘাত পেলে, পুড়ে গেলে বা ক্ষত হলে রোগী সহজে বুঝতে পারেন না এবং তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। একই সঙ্গে ডায়াবেটিক রোগীদের ধমনীর অপর্যাপ্ততা (arterial insuficiency) এবং ইনফেকশন বা সংক্রমণ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় সহজেই পায়ে পচন বা গ্যাংগ্রিন দেখা দেয় এবং অকালে পা কেটে ফেলতে হয়। নিত্যদিন পায়ের যত্ন নিলে গ্যাংগ্রিনের মত মারাত্মক জটিলতা প্রতিরোধ করা যায়।

১) পায়ে বেশি গরম পানি দেবেন না, তাতে পায়ে ফোস্কা পড়তে পারে বা পুড়ে যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্য কাউকে দিয়ে গরম পানি সহনশীল কিনা তা পরীক্ষা করিয়ে নিন।

২) পা অনেকক্ষণ ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন না, তাতে চামড়া নরম হয়ে ফাটল ধরতে পারে। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে আঙুলের ফাঁক পর্যন্ত মুছে নেবেন।

৩) একেবারে ছোট করে নখ কাটবেন না, তাতে আঙুলের মাথায় জখম হতে পারে।

৪) শীতকালে যাদের পা ফেটে যায়, তারা ভেসলিন ব্যবহার করবেন।

৫) সবসময় জুতো পরে হাঁটবেন। কখনও শক্ত এবং আঁটসাট জুতো ব্যবহার করবেন না।

৬) আঘাত লাগতে পারে এমন জিনিস থেকে দূরে থাকবেন, রাতে বা অন্ধকারে সাবধানে পথ চলবেন।

৭) দৈনিক পা পরিষ্কার করবেন।

যা যা খেয়াল রাখবেন

- পায়ের কোনো অংশ লাল হয়েছে কিনা
- পায়ে ফোস্কা পড়েছে কিনা
- চামড়ায় কড়া পড়েছে কিনা
- কালো দাগ দেখা দিয়েছে কিনা
- দুই আঙুলের ফাঁকে সাদা ফাংগাস জাতীয় চর্মরোগ উদ্ভাসিত হয়েছে কিনা
- পায়ে কোনো ফাটল বা ক্ষত হয়েছে কিনা
- নখের কোনায় ঘাঁ বা পুঁজ হয়েছে কিনা

এগুলোর যে কোনো একটি সমস্যা দেখা দিলে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।●

অধ্যাপক ডা. মো. আমিরুল হক
অধ্যাপক, নিউরোলজি বিভাগ, বারডেম, ঢাকা

আদিকাল থেকেই মানুষ অসুখে-বিসুখে প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষভাবে ভেষজ পদার্থ ব্যবহার করে আসছে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এসব ভেষজ উদ্ভিদের অনেকগুলোই লোকজ বা আঞ্চলিকভাবে (folkloric reputation) স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত বিশ্বেও ভেষজ উদ্ভিদের চিকিৎসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাই দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নীরব ঘাতক স্বভাবের যে রোগটি মানবদেহে অসংখ্য ব্যধির উৎস, সেই ডায়াবেটিসের অব্যাহত অভিযাত্রায় বিশ্ববাসী আজ শঙ্কিত। সেজন্য এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথবা আদৌ কোন উপকার করে কিনা তা জানা প্রয়োজন। আমরা এ সংখ্যা থেকে দু'টি করে ভেষজ উদ্ভিদের সুপ্ত গুণাবলী নিয়ে আলোকপাত করবো। আশা করা যায় এটি ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

জুজুবি

প্রচলিত নাম: ভারতীয় জুজুবি

বৈজ্ঞানিক নাম: *Zizypus rugosa Lam*

ইংরেজি নাম: Jujube tree, Indian Jujube

পরিবার (গোত্র): Rhamnaceae

ব্যবহার্য অংশ: পাতা এবং বাকল

ব্যবহার পদ্ধতি: শুকনা পাতা বা বাকল গুঁড়া করে পানিতে মিশিয়ে খাবারের আগে খেতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পাতা বা বাকল গুঁড়া উভয়ই অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিঃসরণে সাহায্য করে। সেজন্য ধরন-২ ডায়াবেটিক রোগীরা উপকৃত হতে পারেন।●

শিয়াকুল

প্রচলিত নাম: শিয়াকুল

বৈজ্ঞানিক নাম: *Zizipus oenoplia (L.) Mill*

ইংরেজি নাম: Jackal jujube

পরিবার (গোত্র): Rhamnaceae

ব্যবহার্য অংশ: পাতা এবং বাকল

ব্যবহার পদ্ধতি: শুকনা পাতা বা বাকল গুঁড়া করে পানিতে মিশিয়ে খালি পেটে খেতে হবে। শুকনা পাতা বা বাকল গুঁড়া রক্তের শর্করা শোষণ বিলম্বিত করে। সেইজন্য ধরন-১ এবং ধরন-২ উভয় রোগীরা খেলে উপকৃত হতে পারেন।

প্রথম পৃষ্ঠার পর: হার্ট এ্যাটাক ও স্ট্রোক এক নয়

বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীরা ২০-২৫% কোন উল্লেখযোগ্য উপসর্গ না নিয়েই নিরবে হার্ট এ্যাটাকের শীকার হয়। প্রথম দিকে উপসর্গগুলি বুকের ব্যথা বা অস্বস্তি, মানসিক উত্তেজনা বা শারীরিক পরিশ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং বিশ্রামে আরামবোধ করে বা উপসর্গ চলে যায়। তবে যখন সত্যি সত্যি হার্ট এ্যাটাক (Acute Myocardial infarction) হয়ে যায় তখন আর বিশ্রামে বা জিহ্বার নিচে নাইট্রেট জাতীয় ঔষধ দিলে কোন প্রকার নিরাময় হয় না। তখন অযথা কালবিলম্ব না করে হাসপাতালের সিসিইউ (করোনারী কেয়ার ইউনিট) বা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে হার্ট এ্যাটাকের কারণে হার্টের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় বা স্পন্দন দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে পেসমেকারের ব্যবস্থা লাগতে পারে

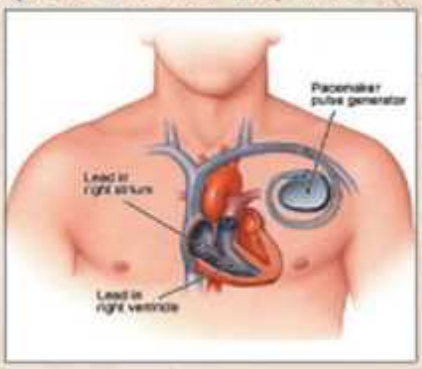

বা DC Shock দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই কোন প্রকার কালক্ষেপন না করে উপযুক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা নিলে মূল্যবান জীবন বাঁচানো সম্ভব।

হার্ট এ্যাটাক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রোগীর রোগ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস ও তথ্য নেয়া এবং বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিশেষ পরীক্ষার ভিতর ইসিজি, কার্ডিয়াক ইনজাইম (Troponin I CK-MB), এক্স-রে, ইকো কার্ডিওগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রুটিন পদ্ধতি হিসাবে ব্লাড সুগার, লিপিড প্রোফাইল, রেনাল ও লিভার ফাংশন টেস্ট করা হয়ে থাকে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে করনারি এনজিওগ্রাম করে করনারির ধমনীর রক্ত সরবরাহের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য করনারি এনজিও প্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারির ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের উন্নত চিকিৎসা এখন বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সফলতার সাথে করা হচ্ছে। যার মধ্যে বারডেম সংলগ্ন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল, সিকদার মেডিক্যাল কলেজ ও ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে হৃদরোগের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হওয়াতে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় ও জাতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও কারণগুলি হার্ট এ্যাটাকের মতই তবে স্ট্রোক দু'ভাবে হতে পারে। ১৫-২০% স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ব্রেনে রক্তসরবরাহের নালীগুলো ক্ষত হয়ে রক্তক্ষরণ করে এবং রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে (Haemorrhagic Stroke)। অন্যভাবে রক্তের নালীগুলির অভ্যন্তরে কোলেস্টেরল ও অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রনে (Athrosclerosis) রক্তনালী সংকুচিত বা বন্ধ হয়ে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত করে (Ischaemic Stroke)। যার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই অজ্ঞান থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতা বা পঙ্গুত্ব সৃষ্টি করে এবং মানুষ তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি অনেকেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হার্ট এ্যাটাকের ক্ষেত্রে হার্টের রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহকারী করনারীর আর্টারিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় সংকুচিত হতে পারে। শুধু সংকোচনের কারণে বুকে ব্যথা, চাপ বা শ্বাসকষ্ট হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে যা কি-না বসা বা বিশ্রাম অবস্থায় রোগীর কোন উপসর্গ করে না শুধুমাত্র কাজ বা চলাচলের সময় রোগীর উপসর্গের সৃষ্টি করে ঐ অবস্থাকে ক্রনিক স্টেবল এনজেইনা পেকটরিস বলে (Stable Angina pectoris)। আবার অন্য ক্ষেত্রে করনারি আর্টারির এ্যাথেরো স্কেলোরোসিস-এর কারণে সংকুচিত হয়ে রক্তনালীর ভিতরে জমা plaque rupture করে রক্তক্ষরণ ও রক্ত জমাট বেধে সম্পূর্ণ রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। তখন ঐ অবস্থাকে একিউট করনারি সিনড্রোম বলা হয় (Acute Coronary Syndrome)। এ ক্ষেত্রে রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে সিসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা করা হয়।

স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও যদি রোগী অজ্ঞান বা পঙ্গুত্ব নিয়ে হাসপাতালে আসে তখন তাকে নিউরোলজিস্ট বা নিউরো সার্জনের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করা হয়।

হার্ট এ্যাটাক (Acute Myocardial infarction) বা স্ট্রোক (Stroke) কোন ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় কোন প্রকার বিলম্ব করা একেবারেই উচিত নয়। যখনই উল্লেখিত উপসর্গগুলি বিশেষ করে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মধ্যবয়সী, ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় তবে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ ডাক্তার, হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর চিকিৎসার চেয়ে প্রতিকার বা প্রতিরোধের দিকে বেশি নজর দেয়া উচিত। তাতে এই ঘাতক ব্যধি দু'টোর চিকিৎসার বিশাল ব্যয়ভার কমানো ও মূল্যবান জীবন বা পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোকের মত ঘাতকব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য আমাদের সচেতন হওয়া উচিত এবং যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে কোলেস্টেরোলের আধিক্য আছে তাদেরকে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখে চলা উচিৎ এবং কারো ধুমপান বা বিভিন্ন ধরনের তামাক জর্দা ব্যবহার করার মত কু-অভ্যাস থাকলে অনতিবিলম্বে এগুলো পরিহার করে এবং খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন ও নিয়মিত ব্যায়াম করার মাধ্যমে সুস্থ জীবন-যাপনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাতে আপনি, আপনার পরিবার ও দেশ নানাভাবে উপকৃত হবে।

একজন চিকিৎসক হিসাবে আপনার সু-স্বাস্থই আমাদের কাম্য। ●

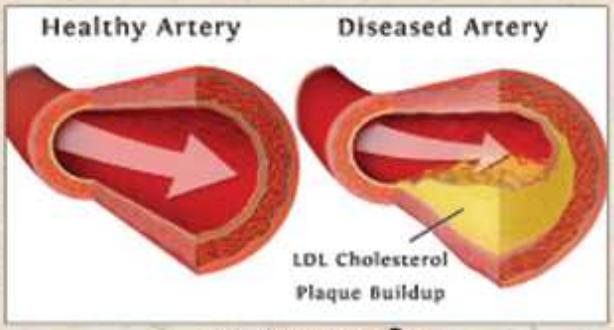

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(সিইও)
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল
সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি

মানবদেহে তেল বা চর্বি কেন প্রয়োজন

আখতারুন নাহার আলো

চর্বি শক্তির ঘনিভূত উৎস। এটি শরীরের জন্য একটি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। চর্বি এমন একটি যৌগ, যা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং ফ্যাটি এসিড দিয়ে তৈরি। এটি দেহের adipose tissue-তে জমা থাকে। এছাড়া চামড়ার নিচেও এটি subcutaneous fat হিসেবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যেমন- কলিজা, মগজ, মাংসপেশি ইত্যাদিতে থাকে। এসব স্থানে চর্বি এমনভাবে সঞ্চিত থাকে, যা উপবাসের সময় কাজে লাগে। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের তুলনায় চর্বি দ্বিগুণ ক্যালরি দেয়।

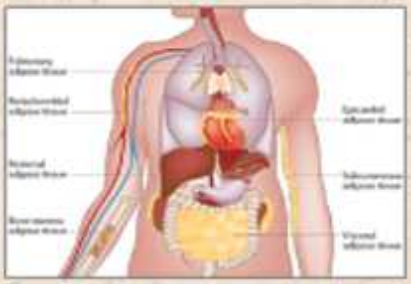

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জেনেছে তেল-ঘি-দুধ-মাখন খেলে শরীর ভালো থাকে। চেহারায় লাবণ্য ও কান্তি আসে। আবার খাদ্যদ্রব্য তেল বা ঘিয়ে রান্না করলে সুস্বাদু হয় এবং এর পুষ্টিগুণ বেড়ে যায়। যেমন- সিদ্ধ আলুর চাইতে ভাজা আলু, রুটির চাইতে লুচি ও পরোটা শুধু মুখরোচকই নয়, এতে ক্যালরিও বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো চর্বিতে আছে ভিটামিন এ, আবার কোনোটিতে আছে ভিটামিন ই। পাম তেলে আছে ক্যারোটিন।

চর্বি প্রয়োজনীয় উপাদান হলেও অতিরিক্ত চর্বি দেহে মেদের আধিক্য ঘটায়। এতে রক্তচাপ, করোনারি হার্ট ডিজিজ, কোলন ক্যান্সার ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তেল-ঘি পানিতে মেশে না বলে গলে না। আবার অবিকৃত অবস্থায় পরিপাকও হয় না। খাওয়ার পর পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে সব চর্বিই বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে প্যানক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত লাইপেজ ও যকৃত থেকে ক্ষরিত পিত্ত লবণের মাধ্যমে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসেরল হিসেবে বিশ্লিষ্ট হয়। আবার অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে উপযুক্ত পরিমাণ পিত্ত যদি খাদ্যের সঙ্গে ঠিকমত মিশতে না পারে তবে চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফলে হজমে গোলমাল দেখা দেয়। মানবদেহে চর্বি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় বলে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন-

১. চর্বি দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে আবৃত করে রাখে।

২. স্নায়ুতন্ত্রকে রক্ষা করে।

৩. দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।

৪. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন অ, ঊ, ঙ, ক এগুলোকে শোষণে সাহায্য করে।

৫. কোষের গঠন ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্য চর্বিতে নিহিত অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড যেমন- লিনোলেয়িক, লিনোলেনিক ও এরাচিডোনিক এসিড প্রয়োজন।

৬. চর্বির গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক্যালরি সরবরাহ করা। যদি খাবারে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট থেকে ক্যালরির ঘাটতি পূরণ না হয়, তাহলে তেল বা চর্বির ওপর নির্ভর করতে হয়।

৭. চর্বি দেহত্বক গঠন ও মসৃণ করে।

৮. চর্বি হরমোন গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজে সাহায্য করে।

৯. এটি ক্ষতিগ্রস্থ কোষকে মেরামত করে ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

১০. চর্বি দেহে শক্তি যোগানো ছাড়াও দেহে জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় সেই চর্বি ব্যবহৃত হয়।

১১. তেল বা চর্বি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ায়, তৃপ্তি আনে ও অল্পতেই পাকস্থলী পূর্ণ করে।

চর্বির শ্রেণীবিভাগ

চর্বি বা ফ্যাটি এসিডকে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

১। সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড

২। অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড

সম্পৃক্ত চর্বি বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড

এগুলো হলো- Palmitic acid ও Stearic acid। যে সমস্ত চর্বি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জমাট বেঁধে যায়, সেগুলোই সম্পৃক্ত চর্বি বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড। যেমন- ঘি, মাখন, মাংসের চর্বি, ডালডা ও নারকেল তেল। এসব

স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড সম্বৃদ্ধ খাবার

বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তী সময় এগুলো হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের তেল বা চর্বি বেশি গ্রহণের ফলে Low density lipo protein বা খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে যায়। এজন্য মোট ক্যালরির ১০%-এর কম সম্পৃক্ত চর্বি গ্রহণ করা উচিত। যদি কারো রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে, তাদের জন্য ১০% চর্বি গ্রহণও বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। গরু ও মহিষের দুধ এবং চর্বিযুক্ত মাংসের মধ্যে সম্পৃক্ত চর্বি থাকে। এছাড়া নারকেল তেল ও পাম তেলের সাহায্যে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি অনেক খাবারেও সম্পৃক্ত চর্বি থাকে।

অসম্পৃক্ত চর্বি বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড

এগুলো হলো- oleic acid, linoleic acid, linolenic acid ও Arachidonic acid. নারকেল তেল ও পাম তেল ছাড়া সব ধরনের ভোজ্য তেলই অসম্পৃক্ত চর্বি। এ চর্বি আবার দু ধরনের। যেমন- মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ও পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড।

অসম্পৃক্ত চর্বি বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড সম্বৃদ্ধ খাবার

মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড

এগুলো হলো- সর্ষের তেল, বাদাম তেল, তিলের তেল ইত্যাদি। এসব তেল গ্রহণ করলে এলডিএল বা খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যায় এবং এইচডিএল বা ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এসব তেল দৈনিক ১০-১৫ শতাংশ গ্রহণ করা উচিত।

পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড

সয়াবিন তেল, কর্ন অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, কটন সিড অয়েল, সাফোলার অয়েল- এগুলো হলো পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড। এ সব তেল ঘরের স্বাভাবিক তাপে কখনো জমাট বাঁধে না। এছাড়া মাছের তেলেও রয়েছে পর্যাপ্ত পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড। এটা এলডিএল কমাতে সাহায্য করে। মোট ক্যালরির ১০ শতাংশের মতো পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড গ্রহণ করা উচিত। আরেক ধরনের ফ্যাটি এসিড আছে, যেটাকে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড বলা হয়। এটা অনেকটা সম্পৃক্ত চর্বির মতোই। উদ্ভিজ্জ তেলকে বাষ্পীভূত করে বনস্পতি বা ডালডা তৈরি করা হলে সেটা ট্রান্স ফ্যাটি এসিড হয়ে যায়। আবার

আনস্যাচুরেটেড খাবার যখন ডুবো তেলে ভাজা হয়, তখনও সেটা ট্রান্স ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত হয়।

চর্বির আর একটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– দৃশ্যমান চর্বি ও অদৃশ্যমান চর্বি।

দৃশ্যমান চর্বি, ঘি, মাখনসহ বিভিন্ন ধরনের তেলকেই দৃশ্যমান চর্বি বলা হয়। এসব তেল বা চর্বি কতোটুকু গ্রহণ করা হলো তা সহজেই বের করা সম্ভব।

অদৃশ্যমান চর্বি: বাদাম, দুধ, তেলবীজ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি হচ্ছে অদৃশ্যমান চর্বি। খাবারে এসব চর্বির পরিমাণ নির্ণয় করা খুব কঠিন।

একজন স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম তেল বা চর্বি প্রয়োজন। তবে Food and Nutrition USA এবং American Heart Association-এর সুপারিশ হলো, দৈনিক ৩৫%-এর বেশি কোনোমতেই তেল বা চর্বি গ্রহণ না করা। এ ছাড়া এর সঙ্গে অবশ্যই উচ্চমাত্রায় ১০% পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত আমাদের দেশের মানুষ মোট ক্যালরির ১০% চর্বি গ্রহণ করে থাকে। তবে পাশ্চাত্যে এর পরিমাণ ৪০%।

মার্জারিন: ১৮৭০ সালে এক ফরাসি বিজ্ঞানী মার্জারিন আবিষ্কার করেন। এটা মাখনের চাইতে দামে কম। মার্জারিন তৈরি হয় নারকেল তেল, বাদাম তেল ও সয়াবিন তেল দিয়ে। গরম তেল দুধের সাথে ভালো করে ফেটিয়ে মার্জারিন তৈরি করা হয়। তারপর হলুদ রঙ মেশানো হয় মাখনের মতো দেখানোর জন্য। এরপর এতে ভিটামিন এ ও ডি যোগ করা হয়। পশ্চিমে মার্জারিন বিক্রি হয় বনস্পতির মতোই। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম মার্জারিনে ৯০০ মাইক্রোগ্রাম রেটিনল ও ৪ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি থাকতে হবে।

মার্জারিন

ঘি: প্রচলিত ধারণা আছে যে ঘি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থাৎ পুষ্টিকর খাবার। দুর্বল স্বাস্থ্য সবল করতে ঘি অব্যর্থ। আসলে তা নয়। সব ধরনের চর্বি ও তেলের ক্যালরি মূল্য একই। বরং উদ্ভিজ্জ তেলের চাইতে প্রাণীজ চর্বিতে অত্যাবশকীয় ফ্যাটি এসিড কম থাকে। ঘি দামি বলে এর সামাজিক মর্যাদা বেশি। এটি একটি সম্পৃক্ত চর্বি।

ভোজ্য তেল: ভোজ্য তেল গ্রহণ নির্ভর করে আর্থিক সঙ্গতি ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর। ইউরোপ ও আমেরিকায় মোট ক্যালরির ৪০% চর্বি গ্রহণ করা হয়। জাপানে এর মাত্রা ৮%- ১০%। উষ্ণ মণ্ডলীয় দেশের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী ১০%-১৫% চর্বি গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে নিম্নবিত্ত শ্রেণী বাদাম তেল, নারকেল তেল, তিলের তেল ও সয়াবিন তেল ভোজ্য তেল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে বনস্পতি ও মার্জারিনের ব্যবহার দেখা যায়। আর, উচ্চবিত্তরা ব্যবহার করেন ঘি, মাখন, সানফ্লাওয়ার অয়েল ও অলিভ অয়েল।

কোলেস্টেরল: এটি রক্তের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন উৎপাদন, চর্বি ও নতুন কোষ গঠনে কোলেস্টেরল অংশ নিয়ে থাকে। তবে সমস্যা হয় তখনই, যখন এটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। জমাট অথবা তরল সব ধরনের চর্বির ক্যালরি মূল্যই সমান। তবে যেসব খাবারে সম্পৃক্ত চর্বি বেশি থাকে, সেগুলি বেশি খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া মানেই রক্তে চর্বি জমে যাওয়া। যখন রক্তে চর্বির আধিক্য ঘটে তখন ধমনীগাত্রে রক্ত সঞ্চালন সীমিত হতে থাকে। আবার কখনো কখনো বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এই বন্ধ হওয়াটা যদি করোনারি ধমনীর মধ্যে হয়, সেটাকে হার্ট এ্যাটাক বলে। আর যদি মস্তিষ্কের মধ্যে হয়, তবে সেটাকে স্ট্রোক বলে।

কোলেস্টেরল

একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের ১০০ মিলিলিটার রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা হওয়া উচিত ১৫০-২০০ মিলিগ্রাম। শুধু তেল খেলে কোলেস্টেরল বাড়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ অধিকাংশ ভোজ্য তেলই (নারকেল ও জমাট পাম তেল ছাড়া) কোলেস্টেরলমুক্ত। যদি তেলের সঙ্গে অন্যান্য কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার খাওয়া হয় তাহলে কোলেস্টেরল বেড়ে যায়।

চর্বি গ্রহণের সঙ্গে হার্ট এ্যাটাকের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আবার দেখা যায়, খাবার ছাড়াও আরো কিছু বিষয়কে হার্টের ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন-

১। মধ্য বয়স হলে ২। পুরুষ হলে ৩। বংশগত প্রভাব থাকলে ৪। ধূমপান করলে ৫। ডায়াবেটিস থাকলে ৬। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে ৭। পরিশ্রম না করলে ৮। ওজনাধিক্য হলে ৯। মানসিক চাপ থাকলে।

আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনের পথ্য নির্দেশনা

১। সম্পৃক্ত চর্বি ও ট্রান্সচর্বি মোট ক্যালরির ১০ শতাংশের কম (অর্থাৎ ৭ শতাংশ) হওয়া উচিত।

২। পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট মোট ক্যালরির ৮-১০ শতাংশ হওয়া উচিত।

৩। শরীরে মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকবে যতোটুকু চর্বি গ্রহণ করার কথা ঠিক ততোটুকুই। অর্থাৎ ১০-১৫ শতাংশ।

৪। দৈনিক মোট ক্যালরির ৩০ শতাংশের বেশি চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ করা উচিত নয়।

৫। কোলেস্টেরল গ্রহণ করতে হবে প্রতিদিন ৩০০ মিলিগ্রামের কম।

৬। প্রতিদিন ২-৪ গ্রামের মতো সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণ করতে হবে।

শেষ কথা

পুষ্টিরক্ষার জন্য চর্বি ও তেল সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না। এগুলো অবশ্যই খাওয়া উচিত। কারণ ত্বক ও চুলের সৌন্দর্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ ও ই চর্বিতে দ্রবণীয়। চর্বির অভাবে ত্বকের চাকচিক্য কমে যায়। সুতরাং চুল ও ত্বকের আর্দ্রতার জন্য ও মসৃণতার জন্য চর্বি ও তেল দুটোই দরকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অভিমত হলো, দৈনিক যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন অর্থাৎ যতটুকু ক্যালরি প্রয়োজন তার ১৫-৩০ শতাংশ আসা উচিত চর্বি জাতীয় খাদ্য থেকে। এজন্য অন্যান্য খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন ১০- ১৫ চা চামচ তেল আমাদের প্রয়োজন। যদিও এ দেশের অধিকাংশ মানুষ মাথাপিছু প্রতিদিন ৫-৭ চা চামচের বেশি তেল বা চর্বি খায় না। এটা প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। তেলের পুষ্টিমানের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তেল গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।●

আখতারুন নাহার আলো
কবি ও কথাসাহিত্যিক। প্রিন্সিপাল নিউট্রিশন অফিসার, বারডেম

ডায়াবেটিস নিউজলেটার

১৬ সংখ্যা | অক্টোবর | ২০১৫ দাম ১০ টাকা

প্রধান সম্পাদক: অধ্যাপক একে আজাদ খান, উপদেষ্টা সম্পাদক: মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন
সম্পাদক: ফরিদ কবির, নির্বাহী সম্পাদক: শহিদুল আলম, সহকারী সম্পাদক: মীর সারওয়ার আলম
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক আরডিটিসি প্রিন্টিং প্রেস জুরাইন ঢাকা থেকে প্রকাশিত।